ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবন
(স্বামীর ভূমিকা পর্ব)

বিবাহ আসরে মাত্র দুটি কথার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অজানা অচেনা দুটো জীবনের মধ্যে পুর্বাপর বিরল যে নিগূঢ় সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তা আল্লাহ্ পাকের কুদরতের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । আল্লাহ্ পাকের কুদরতের নিদর্শন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পক্ষেই দেখানো সম্ভব নয় । যেমন আকাশ, যমিন, চাঁদ, সূর্য, আলো, বাতাস, পানি ইত্যাদি এ সব কিছুই শুধুমাত্র ঐ পাক জাতের সুনিপুণ কারুকাজ, আল্লাহ্ পাকের কুদরতের নিদর্শন । ঠিক তেমনি ভাবে বিয়ের দুটো বুলির মাধ্যমে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা আর সুখ দুঃখে পারস্পারিক সহমর্মিতার যে অমোঘ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তা অঢেল বিষয় সম্পত্তি বা জাগতিক কোন কিছুর বিনিময়েও অর্জন করা সম্ভব নয় । এ অতুলনীয় সম্পর্ককে আল্লাহ্ পাক তার কুদরতের একটি নমুনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ○ সূরা আর-রূম - ২১ ।

''আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন ।''

পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ । পারস্পারিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না । আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য-মনের শান্তিকে স্থির করেছে । এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয় । এ আয়াতে প্রেমপ্রীতির এ সম্পর্ককে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের এক নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । এ সম্পর্কের কারনে দৃষ্টির পাক পবিত্রতা অর্জন সম্ভব হয়, দু'জনে মিলে তাকওয়া বা খোদাভীতির জীবন যাপন সহজ হয়ে যায় । এ সম্পর্কই নিজেদেরকে অশ্লিলতা থেকে বাঁচিয়ে পাক পবিত্রতা অর্জনের একমাত্র পথা। পারস্পারিক ওয়াদা নিবন্ধনের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ হয়, শুধু দু'জন দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয় অন্য সব জায়গা থেকে দৃষ্টি সরে যায়, এরই নাম তাকওয়া, এরই নাম পাকিজা, এরই নাম ইফফাত আর এরই নাম দ্বীন ।

আদম সন্তানের চির শত্রু হলো শয়তান, মানুষের মধ্যে এই ধরনের নিবিড় সম্পর্ক তার চোখের বিষ । যেহেতু এ সম্পর্ক তাকওয়া অবলম্বনের, পাকপবিত্রতা অর্জনের আর গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, তাই শয়তান তার সমগ্র কলা কৌশল ব্যয় করতে থাকে যে কি ভাবে ছোট্ট দুটি কথার স্বীকারোক্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া যায় । সে তার কলা কৌশলে দু'জনের মনের মধ্যে সন্দেহ উদ্ভবের সার্বিক চেষ্টা চালায়, আর সুদুর প্রসারী দাম্পত্য জীবনে সামান্য সহমর্মিতার মাধ্যমে সহজেই মিটিয়ে ফেলা যায় এমন কোন ছোট খাটো ঘটনাকে অবলম্বন করেই শয়তান তার প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করে । অকৃত্রিম বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত মধুর সম্পর্কে রোপিত হয় অবিশ্বাস আর সন্দেহের বীজ । মনের মধ্যে সন্দেহের জাল দিনে দিনে বিস্তৃত হতে থাকে আর পরস্পরের মধ্যে দূরত্বও বাড়তে শুরু করে । শয়তানের সর্দার ইবলিশ তার সেই সাগরেদের উপর সব চেয়ে বেশী খুশী হয় যে নাকি কোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাটল ধরাতে

সক্ষম হয় । মুসলিম শরীফে হাদিস বর্ণীত হয়েছে, ‘‘হুজুর পাক (সাঃ) বলেনঃ শয়তানের সর্দার ইবলিশ পানির উপর তার সিংহাসন বসিয়ে তার সাগরেদদের কাছ থেকে তাদের কৃত কার্য্যকলাপের বর্ণনা শুনে । এক সাগরেদ বর্ণনা করে যে সে একজনকে এমন কথোপকথোনে মশগুল করে দেই যে তার অজু থাকা স্বত্বেও সে জামাত ধরতে ব্যর্থ হয়, ইবলিশ এতে খুশী হলেও তেমন একটা খুশী হয়না, দ্বিতীয় সাগরেদ এসে বলে যে আমি একজনকে এমন কাজে ব্যস্ত করে দেই যে সে নামাযই কাজা করে ফেলে, ইবলিশ এতেও আশানূরূপ খুশী হয় না, আরেকজন এসে বলে আমি আজ নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তো এমন একজনকে এমন ঘুমে মশগুল করে দেই যে সে তার তাহাজ্জুদ পড়তে পারেনি, এখনও ইবলিশের খুশী ঐ পূর্বোবতই, অবশেষে আরেক সাগরেদ এসে বলে যে মরিয়ম আর আব্দুর রহমান দু’জনে খুবই সুখে জীবন যাপন করছিল আজ তাদের মধ্যে আমি লড়াই লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি আর তাদের সম্পর্ক এমন পর্য্যায়ে পৌঁছেছে যে, কেউ কারো নাম পর্যন্ত শুনতে রাজী নয়, ইবলিশ খুশীতে আটখানা হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে যে তুই হলি আমার আসল সাগরেদ, একটা কামের মত কাম করে এসেছিস ।

দাম্পত্য জীবনে আনমনা হয়ে, কম গুরুত্বের সাথে, ধারনার বশবর্তী হয়ে বা হাসি মজার ছলেও নিজেদের মধ্যে মনোমালিণ্যের সামান্যতম স্থান দেওয়াও মানুষের জীবনের বরবাদির জন্য যথেষ্ট । একদিনের ধারনা’ই পরবর্তীতে বাস্তবতার রূপ ধারন করে, এতে করে জায়েয সম্পর্কে ফাটল ধরে আর উভয়ের জন্য গুনাহ্‌র রাস্তা প্রসারিত হয়ে যায় । মানবকূলে নির্ভূল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃত গুনাবলী আল্লাহ্‌ পাক পুরুষের মধ্যে রেখেছেন । কখনই এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়া উচিত নয় যে, স্ত্রী তার হক আদায়ের হিসাব নিকাশে লেগে যায়, আর স্বামী তার হক আদায়ের হিসাব কশে । আর এ কথাগুলো শুধুমাত্র কোন বিশেষ জায়গা বা গোষ্ঠির জন্য নয় বরং এ তো সার্বিক ভাবে সর্বকালের সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রজোয্য । তাই আপোষে সমঝোতার মাধ্যমে প্রেম ভালোবাসার আবেগে আপ্লুত নরম নমনীয় ভাষায় কথোপকথোন হ’লে এমনটা না হওয়াই স্বাভাবিক । তবে কোন কারনে গৃহকর্তৃ যদি নারাজ হয়েই যায় তবে মুখে মিষ্টি ঢেলে দেওয়া চাই, যাতে কথা যা বের হয় মিষ্টি মিষ্টিই বের হয়, স্বামীরই সহ্য করে নেওয়া উচিত । হুজুর পাক (সাঃ) উনার আনিত দ্বীনকে বিশ্বব্রম্মান্ডের সমস্ত সৃষ্টিজগতের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব প্রতিপালনে নিজের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে সমগ্র মানুষের জন্য নজির সৃষ্টি করে গেছেন । উনার পারিবারিক জীবন দিয়ে উনি উম্মতকে প্রেম আর ভালবাসার শিক্ষা দিয়ে গেছেন, শিখিয়ে গেছেন কোন স্বামীর এমন কোন পথ অবলম্বন করা উচিত নয় যাতে করে স্ত্রীর মন ভেংগে পড়ে । পুরুষদের সব সময় এ কথা মনে রাখা উচিত যে, এখন যে আমার স্ত্রী তার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক ছিল, সে তো আমার অজানা অচেনা এক অপরিচিতা বৈ কিছুই ছিল না, আর আজ আল্লাহ্‌র হুকুমে তার সাথে আমার এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ।

এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, এটা আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর এক বিরাট বড় কুরবানী যে, তারা তাদের মেয়েকে লিখিয়েছে পড়িয়েছে আদব কায়দা শিখিয়েছে আর এত কষ্ট করে মানুষ করার পর মাত্র দু’কথার অংগীকারের কারনে বাকি জীবনের জন্য আমার হাতে তুলে দিয়েছে । যদি আল্লাহ্‌র হুকুম না হতো আর নবী করিম (সাঃ) এর সুন্নত না হতো তবে কোন বাবামা নিজের রক্ত পান করিয়ে বড় করা আপন মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দিত না । এটা অনেক বড় কুরবানীঃ মেয়েকে ছোট থেকে বড় করে, তাকে আচার ব্যবহার শিখিয়ে, সেবাযত্নের শিক্ষা দিয়ে অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুমে নিজের বুকে পাথর বেঁধে বেটিকে বিদায় করে দেওয়া । এই বাস্তবতা সব সময়ই মনে রাখা উচিত, আর ঐ মেয়ে যার বয়স মাত্র ১৭/১৮ বছর তারও বিরাট ত্যাগ যে শুধু দুটি কথার উপর ভরসা করে নিজের ঘর ছেড়েছে, মা বাপকে ছেড়েছে, ভাইবোনকে ছেড়েছে আর আল্লাহ্‌র হুকুমে দুটি কথার কারনে সবাইকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে এসেছে, এসে যে জাগায় নিজের মা আর বাবা ছিল সে জাগায় শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে বসিয়েছে আর স্বামীর আত্মীয়স্বজনকে নিজের আত্মীয়স্বজন বানিয়ে নিয়েছে । তাই এটা শ্বশুর শ্বাশুড়ীর জন্য যেমন বিরাট ত্যাগ তেমনি তাদের মেয়ের জন্যও বিরাট কুরবানী যে সে জীবনভর স্বামীর সূখদুঃখের সাথী হিসেবে থাকার

অংগীকার নিয়ে ছোট থেকে দেখে আসা আপন পরিবেশকে ছেড়ে চিরজীবনের জন্য স্বামীর ঘরে চলে এসেছে । এই ত্যাগের বদলাতো শুধু এটাই হওয়া উচিত যে সর্বদা আন্তরিকতা থাকবে, কোন ঘাত প্রতিঘাত থাকবে না, আমাদের কোন কথায় কাজে তাদের মন যেন ভেংগে না পড়ে ।

হুজুরে পাক (সাঃ) আজওয়াজে মুতাহারাতের সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়ে গেছেন দিলদারী করেছেন কখনো কারো মন ভাংতে দেননি । হজরত আয়েশা (রাঃ) এর ৬ বছর বয়সে হুজুর (সাঃ) এর সাথে বিয়ে হয় আর ৯ বছর বয়সে উনার রুখসতি হয় অর্থাৎ হুজুরের ঘরে আসেন । আজকাল শ্বাশুড়ীর সাথে বউ এর দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার মূল কারন শ্বাশুড়ীরা বউ এর বয়সের চাহিদা পূরন করেন না ।বউ আসতেই বাড়ী জুড়ে কানাঘুষা চলতে থাকে বউ এর চাল চলন কেমন, কথা বার্তায় কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি । ১৬ বছরের বউকে যেন এক দিনেই বুড়ি হয়ে যেতে হবে । হুজুর পাক (সাঃ) সব সময়ই বয়স এবং মেজাজের গুরুত্ব দিয়েছেন । বুখারীর রেওয়ায়েতে ‘‘হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ আমি যখন ৯ বছর বয়সে হুজুরের (সাঃ) ঘরে আসি তখন আনসারদের ছোট ছোট মেয়েরা আমার সাথে খেলা করতে আসতো, আমরা খেলতে থাকতাম আর যখন হুজুর বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসতেন আমার সাথীরা সবাই লুকিয়ে পড়তো, তখন হুজুর তাদেরকে আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন খেলার জন্য আর আমরা খেলতে থাকতাম ।’’ এটা বয়সের আর মেজাজের চাহিদা ছিল, হুজুর তা পূরণ করেছেন । বুখারীর আরেকটা রেওয়ায়েতে উম্মুল মুমিনিন বর্ণনা করেন ঃ ‘‘সে সময় হাবশার লোকেরা মসজিদে নববীর বাহির চত্তরে যুদ্ধ অনুশীলনের খেলা খেলতো । তখন পর্দার আয়াত নাজিল হয়ে গেছে, একদিন ঐ খেলা শুরু হলো আমি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গেলাম হুজুর আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন আর আমাকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে দিলেন, আমার বয়সের কারনে আমি বহুক্ষন যাবত ঐ খেলা দেখতে থাকি, আর যতক্ষন আমি খেলা দেখতে থাকি হুজুর (সাঃ) ও ততক্ষন আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকেন ।’’ এভাবে হুজুর মেজাজের চাহিদা পূরন করেন আর এই ছিল উনার দিলদারী । একবার হুজুর (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা দেন সে সময় আয়েশা হালকা পাতলা ছিলেন উনি হুজুরের আগে চলে যান । পরেও আরেকবার যখন আয়েশার মধ্যে কিছুটা ভারত্ব এসে পড়ে তখন উনাদের মধ্যে আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হয়, এবার হুজুর (সাঃ) আগে চলে যান । আয়েশার মন খারাপ হয়ে যেতে পারে মনে করে হুজুর (সাঃ) তাকে বলেন যে দেখ আগের বার তুমি প্রথম হয়েছিলে আর এবার আমি প্রথম অতএব আমরা সমান সমান হয়ে গেছি । কোনরকম মনোকষ্টের আগেই তিনি সমঝোতা করে নিলেন যেন মন না ভাংগে ।

এটা কোন মামুলি কথা নয় যে হুজুর (সাঃ) তাঁর আমল দিয়ে মানুষকে মনযোগানোর শিক্ষা দিয়েছেন । যতদিন কোন ঘরে এ ভাবে মনযোগানোর আমল জারি থাকবে ঐ ঘর জান্নাত হয়ে থাকবে । আর যখনই কোন ঘরে কেউ কারো মনকষ্টের কারন হয়ে যাবে মানষিক শান্তির আরাম আয়েশ থেকে সে দূরে সরতে থাকবে, জীবন হয়ে উঠবে বিস্বাদময় জাহান্নামের আলামত । হাজারো উপমা আছে আমাদের নবীজীর জীবনে । বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে ঃ ‘‘হুজুর পাক (সাঃ) এর অভ্যাস ছিল উনি প্রতিদিন আসরের পর সবার মনসন্তুষ্টির নিয়তে সব স্ত্রীদের সাথে অল্প অল্প সময়ের জন্য একে একে দেখা করতে যেতেন । প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে তিনিই প্রথম সালাম করতেন আর তিনার শিক্ষাও ছিল এই যে ঘরে গিয়ে প্রথমে সালাম করো আর ঘর থেকে বিদায় নেবার সময়ও সালাম দিয়ে বিদায় হও । আজকাল এমনকি শিক্ষিত মুসলমান পরিবারেও সালামের রেওয়াজ নাই অথবা স্ত্রীই শুধু সালাম করবে এমন অপেক্ষায় থাকা হয়, আবার কোন কোন সময় সালাম কালাম বা অনুমতি ব্যতিরেকেই সোজা অন্দরমহলেও প্রবেশ করা হয়ে থাকে । হুজুর পাক (সাঃ) হজরত আনাস (রাঃ) কে বলেছিলেন যে যখন তুমি তোমার ঘরে যাও তোমার স্ত্রীকে সালাম করো এটা তোমার ও তোমার ঘরের জন্য মিল মহব্বত আর বরকতের কারন হবে ।

এমনি একদিন যখন হুজুর (সাঃ) আসরের পরে স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে বের হলেন সেদিন

হজরত যয়নব (রাঃ) এর ঘরে কোথাও থেকে মধু এসেছিল তিনি হুজুরকে বললেন তা খাবার জন্য, হুজুর খেলেন এভাবে একদিন দুইদিন তিনদিন উনি যয়নবের ঘরে তা খেতে থাকলেন । আর ঐ ঘরে দেরী হওয়াতে অন্যান্য স্ত্রীরা অপেক্ষায় থাকতে থাকতেন । যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে আর প্রত্যেক স্ত্রীই এমন মনে করে যে আমার স্বামী আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসুক তবে এতে দোষের কিছু নাই বরং এমনটা হওয়াই উচিত । কিন্তু কেউ যদি এমন মনে করে যে শুধু আমাকেই ভালবাসবে আর অন্য কাউকেও নয় তবে এমন ইচ্ছা খুবই দোষনীয় । এমনি করে রোজই যখন যয়নবের ঘরে হুজুরের দেরী হওয়া শুরু হয়ে গেল তখন হজরত আয়েশা (রাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন আর হজরত হাফসা (রাঃ) কে শিখিয়ে দিলেন যে হুজুর যখন তোমার ঘরে আসবে তখন বলবে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি তো মাগাফির খেয়েছেন । মাগাফির হলো এক ধরনের গাছের আঠা যা খুবই দুর্গন্ধযুক্ত । হুজুরকে হাফসা (রাঃ) এমনটা বললে তিনি বললেন কই আমি তো শুধু মধু খেয়েছি । হাফসা (রাঃ) বললেন যে তাহলে নিশ্চয় মৌমাছি ঐ মাগাফির গাছে বসে তার রস চুসে নিয়ে সেই মধুর সাথে মিশিয়ে থাকবে । হুজুর (সাঃ) এমনিতেই কোন দুর্গন্ধযুক্ত খাবার যেমন কাঁচা পেয়াজ রসূন ইত্যাদি খেতেন না । হুজুর (সাঃ) মধু খেয়েছেন আর হাফসা (রাঃ) বলেছেন যে তিনি মাগাফিরের গন্ধ পেয়েছেন আর এতেই হুজুর ধরে নিয়েছেন যে আমার মধু খাবার কারনে আজওয়াজে মুতাহারাত আমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছে এটা নিশ্চয় তাদের কষ্টের কারন হয়ে থাকবে । তাই তিনি কসম খেয়ে বলেন আর মধু খাবেন না । কোন হালাল জিনিসকে হারাম স্থির করে নেওয়া নিষিদ্ধ । কিন্তু কোন যোগ্য কারনে কোন হালাল জিনিসের ব্যবহার ছেড়ে দেওয়াতে কোন দোষ নাই জায়েয আছে । স্ত্রীগণের মনরক্ষার খাতিরে ও উনার মুখের সামান্যতম গন্ধও যাতে তাঁর স্ত্রীদের এতটুকু কষ্টের কারন না হয় শুধুমাত্র সে কারনেই তিনি মধু খাওয়া ছেড়ে দেবেন স্থির করে নিয়েছিলেন । যিনি সমস্ত আম্বিয়াদের আম্বিয়া দোজাহানের সর্দার এ'ই ছিল তার স্ত্রীদের সাথে আখলাক । স্ত্রীদের মনোতুষ্টির লক্ষ্যে হুজুর (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্ পাকের একটি হালাল নেয়ামত একেবারে পরিত্যাগ করা যেটা পরবর্তীতে উম্মতের জন্য নবী করিম (সাঃ) এর একটি সুন্নত হিসাবে কায়েম হয়ে যেতে পারে যা তাদের জন্য পালন করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে তাই আল্লাহ্ পাক তা পছন্দ করেননি, যার কারনে কোরানের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয় ।

يَآ يُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ○ সূরা তাহ্রীম - ১ ।

''হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন ?''

স্ত্রীদের মনযোগানোর খাতিরে ও তাদের মনকষ্টের কোন কারন না হবার খেয়ালে হুজুর সমস্ত উম্মতের জন্য এক নজির সৃষ্টি করে গেছেন । আমাদের দাম্পত্য জীবনের চলন বলনে হুজুরকে পুরা উম্মতের জন্য নমুনা হিসেবে নেওয়া উচিত । সব স্বামীদের এমন মনোভাব হওয়া উচিত যেন কোন অবস্থাতেই স্ত্রীদের মন ভেংগে না যায় । কোন কোন সময় এমন হয় যে স্বামী তেমন একটা না ভেবেই কোনকিছু বলে বেমালুম ঘুমিয়ে পড়লো ওদিকে স্ত্রী হয়তো সেই কথা সহ্য করতে না পেরে সারা রাত না ঘুমিয়ে কেঁদে কাটিয়ে দিল, অথচ স্বামীর হয়তো সে খবর অজানাই থেকে যায় । এ সম্পর্কে আমাদের খুবই সাবধান থাকা উচিত । তাই বিদায় হজ্বেও হুজুর (সাঃ) মহিলাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে দেখ তোমরা পুরুষরা মাটির তৈরী আদমের বেটা আর মহিলারা বিবি হাওয়ার বেটি আর হাওয়াকে আদমেরই বাম পাঁজরের হাড্ডি থেকে তৈরী করা হয়েছে । আর পাঁজরের হাড্ডির সৌন্দর্য্য তার বক্রতার মধ্যেই । তাই বক্রতা মহিলাদের সৌন্দর্য্য বর্ধনকারী স্বভাবজাত গুনাবলী । তাই তাদেরকে সোজা করার চেষ্টা করতে গিয়ে ভেংগে ফেলার চাইতে তাদের সাথে সমঝোতা আর সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তুলে সুখ আর শান্তির জগতে অবগাহন করাই বুদ্ধিমানের কাজ ।

হুজুর পাক (সাঃ) বলেন কামেল দরজার ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে নরম, সুন্দর ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করে । আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হুজুর পাক (সাঃ) বলেন ‘‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম । আর দেখ আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করে থাকি ।’’ আমাদের উচিত কিছু নরম কথাবার্তা শেখা এর আসর কখন হবে যখন আমাদের আলাপ আলোচনায় আন্তরিকতা, নমনীয়তা, সহানুভুতি আর সহমর্মিতা আসবে তখন শয়তানের কারসাজীর আর কোন সূযোগই থাকবে না । কেবলমাত্র এই ধরনের আখলাক আর ব্যবহারই আমাদের ঘরকে বেহেশতে পরিণত করতে পারে । এইরূপ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব স্বামীর উপর, দাম্পত্য জীবনের পথ প্রদর্শনের মূল কর্ণধারই হলো পুরুষ । পুরুষ যদি সহজেই রেগে যায় তবে অপর পক্ষেরও পারা গরম হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পুরুষ যদি একটু সহ্য করে তবে বিপরীত পক্ষও অত সহজেই গরম হবে না, কমতি মূলত পুরুষদের তরফ থেকেই হয়ে থাকে । মহিলাদের তরফ থেকেও কমতি হয় তবে পুরুষরা নিজে নিজেই নিজেকে বড় মনে করায় সহজেই রেগে বলে ফেলে যে এমনটা কেন বললো সে আমার সামনে, আর এ কারনেই পুরুষের কমতি আগে আগে চলে । মহিলাদেরও সহ্যশক্তি আর একটু বাড়ানো দরকার, তাদেরকেও নরমী, সহমর্মিতা ও ভালবাসার পাবন্দী করতে হবে, শরীয়তে স্বামীকে যেমন মাথার মুকুট বলা হয়েছে তেমনি তাকে পরম বন্ধুও বলা হয়েছে, তাই দুই রকম সম্পর্কেরই হক আদায় হতে হবে । এখনও কোন কোন জায়গায় স্বামীর নাম নিলে বিয়েই ভেংগে যায় । পাশ্চাত্য দেশগুলোতে তো স্বামীর নাম ধরে ডাকাকেই সভ্যতা মনে করা হয়ে থাকে, আর এর আসর আজ আমাদের মুসলমানদের উপর এসে পড়েছে । অনেকেই আমরা স্বামীর নাম ধরে ডেকে আভিজাত্য প্রকাশের চেষ্টা করছি অথচ শরীয়ত বিনা প্রয়োজনে স্বামীর নাম না নেওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছে । প্রয়োজনে স্বামীর নাম নেওয়া জায়েয আছে এতে কোন দোষ নাই । হজরত আয়েশাও (রাঃ) কখনো কখনো হুজুরের নাম নিয়েছেন যেমন কখনো কথা প্রসংগে বলেছেন যে মুহম্মদের রবের কসম ইত্যাদি ইত্যাদি । এতে করে হুজুরের নামতো নেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু উনার অভ্যাস ছিল তাঁর নাম না নেওয়া । বার বার স্বামীর নাম নিলে অন্তর থেকে তার ভক্তি শ্রদ্ধা উঠে যায় ।

মূল প্রসংগ হলো স্বামীরই উচিত বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের সম্পর্ককে মধুর করে গড়ে তোলা, সমালোচনার সুযোগই যাতে না আসে একে সামলিয়ে রাখতে হবে স্বামীকেই । বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মানুষের দাম্পত্য জীবনের অবস্থা কল্পনাতীত । কোন সংসারে বিবাদ প্রতিনিয়ত লেগেই আছে, কোনটা টিকে আছেতো না থাকার মতই, কেউ বা তালাকের দোরগোড়ায় আবার তালাকপ্রাপ্তাদের সংখ্যাও হিসাব ছাড়া অথচ এদের প্রতিকারের কোথাও কোন ব্যবস্থা নেই, এই হলো তথাকথিত সভ্য সমাজের সামাজিক অবস্থা । যে কোন দেশেই যেখানে অন্তত মুসলিম কমুনিটি আছে সেখানে এমন একটি সংগঠন বা কমিটি গড়ে তোলা দরকার যারা এই ধরনের দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির প্রাথমিক অবস্থা থেকেই বা এর যে কোন পর্য্যায়ে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে, এই কাজ একটি বিরাট বড় এবাদত । হুজুর পাক (সাঃ) বলেছেন যে, যেকোন মানুষের মধ্যেই যেমন কিছু দোষ আছে আবার তেমনি কিছু গুনও আছে । তাই কোন মুমিন যেন তোমরা কোন মুমিনাকে আলাদা করে দিওনা, তার কোন দোষ থেকে থাকলে তার দিকে না তাকিয়ে তার গুনের উপর ভরষা করে জীবন কাটিয়ে দাও । সবাই চায় যে আমার সাথে যার বিয়ে হবে তার যেন কোন দোষই না থাকে, কোন কিছুই যেন কমতি থাকা চলবে না । এমন উঁচু প্ল্যান নিয়ে যে চলবে তার তো উচিত তশবীহ্ হাতে নিয়ে মসজিদের প্রথম কাতারে বসে পড়া । কোন ত্রুটিমুক্ত জাততো কেবল আল্লাহ্ পাক । আল্লাহ্র বন্দেগী করেই তার জীবন কাটিয়ে দেওয়া উচিত । মানুষের মধ্যে কমতি তো কিছু থাকবেই, দোষ যেমন থাকে গুনওতো কিছু থাকে, দৃষ্টি ঐ গুনের প্রতিই হওয়া চাই । আর দোষ থাকলে তা দূর করার চেষ্টা চালাতে থাকতে হবে ।

এক বুজুর্গ ছিলেন যার স্ত্রী ছিল খুবই তেজী, রোজ বুজুর্গ ঘরে ফেরার সংগে সংগেই সে তার উপর চড়াও হয়ে যেত কিন্তু তিনি তাকে কখনই কিছু বলতেন না । একদিন কেউ একজন বুজুর্গকে

বললো যে তোমার উপর রোজ এমন বাক বিতন্ডা হতে থাকে তুমি কেন এর একটা বিধি ব্যবস্থা করো না । তিনি বললেন বিধি ব্যবস্থা করে ফেলা তো খুবই সহজ কাজ কিন্তু এর সাথে টিকে থাকতে পারার মধ্যেই তো প্রকৃত সার্থকতা । আমার স্ত্রীর মধ্যে দোষ আছে সত্য কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা গুন আছে যার কারনে আমি সবসময় তার সবকিছু সহ্য করি কোন প্রতিউত্তর করিনা, তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করার চিন্তা করিনা, আর কোনদিন তা করবোও না । তার এই গুন হলো সে খুবই পাক পবিত্র, আজ আমাকে যদি ৫০ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর আমি যদি তাকে ঘরের এক কোনায় বসিয়ে রেখে যাই তবে ৫০ বছর সে সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে কোনদিন কারো দিকে মুখ তুলে তাকিয়েও দেখবে না । একেই বলে গুনের দিকে দৃষ্টি রেখে হুজুরের (সাঃ) হাদিসের উপর আমল । মির্জা জানজানা আর একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন, উনার অনেক সাগরেদ ছিল । কিন্তু উনার স্ত্রী খুব চোখা ছিলেন যিনি সবসময় স্বামীর সাথে লেগে থাকতেন কিন্তু বুজুর্গ সবকিছু সহ্য করে যেতেন । একবার তার এক সাগরেদ হাজার মাইল দূর থেকে তার সাথে দেখা করতে আসলো আর সে সময় তিনি বাসায় ছিলেন না । এই সুযোগে তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কোত্থেকে এসেছ ? সে বললো আমি তো উমুক জায়গা থেকে এসেছি । স্ত্রী বললো তোমরা খামোখা কেন এর পিছে ছুটাছুটি কর আমি এর সাথে এত বছর যাবৎ সংসার করছি কই কোনদিন তো তার মধ্যে কোন বুজুর্গি দেখিনি, আরো আমি রোজ তার সাথে লেগে থাকি । সাগরেদ বিফল হয়ে ফিরে যাচ্ছিল পথে একজন বললো দেখ তুমি কিছু মনে করোনা ঐ মহিলা এই রকমই, বরং তুমি ঐ জংগলে যাও সেখানে বুজুর্গ খড়ি কাটতে গেছে সেখানেই তার দেখা পাবে । সে জংগলের দিকে রওনা হলো, পথে দেখতে পেল বুজুর্গ বাঘের পিঠে করে খড়ি নিয়ে আসছে । বুজুর্গ জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি আমার বাসাতেও গেছিলে নাকি ? সে বললো আমি তো সেখান থেকেই আসছি । বুজুর্গ বললেন তোমার চেহারায় আমি সেটার ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম, দেখ আমার স্ত্রীর উপর আমার এই ধৈর্য ও সহ্যের কারনে আল্লাহ্ আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে এই বাঘকে আমার বস্য করে দিয়েছেন আর রোজ আমি তার কাছ থেকে কাজ নিয়ে থাকি ।

এই সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের এমনভাবে চলা উচিত যে স্ত্রীর ফোন করার কোন দরকারই যেন না পড়ে । ফোন আমাদের জন্য বহুবিধ সর্বনাশের মূল । আমাদের রহন সহনের মধ্যে যেন এমন নমনীয়তা কমনীয়তা আসে যে বিবাদের কোন চিন্তাই মনে স্থান না পায় । স্ত্রীর সাথে যেকোন ব্যবহারের সময়তো আমাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে আজ আমার মেয়ে যদি অন্যের ঘরে থাকতো আর তার সাথে এমন ব্যবহার করা হতো তবে বাপ হিসেবে আমার কাছে কেমন লাগতো । আমি কি চাইতাম যে আমার মেয়েকে কেউ ভালমন্দ বলে, বাস্তবে আমার স্ত্রীওতো কারো না কারো মেয়েই । এটাই চিন্তা করা উচিৎ যে আমি যেটা আমার মেয়ের সাথে অন্যের করা পছন্দ করিনা আমি নিজে কিভাবে তা অন্যের মেয়ের সাথে করবো । এক দিনমজুরের ঘটনা সে কোন রকমে দিনাতিপাত করতো, ভালমন্দ খাবার তেমন একটা জুটতো না । একবার কিছু কিছু করে পয়সা জমিয়ে সে একটা মুরগী আর মসল্লা কিনে এনে স্ত্রীর হাতে দিল । স্ত্রী রান্না করে খাবার বাড়লো স্বামী গোস্ত মুখে দিতেই বুঝতে পারলো লবন অনেক বেশী । সে দিনমজুর হলেও নম্র স্বভাবের ছিল, চিন্তা করলো আমার মেয়ে যদি এই গোস্ত রান্না করতো আর আমার জামাই আমার মেয়েকে যদি এর কারনে গালিগালাজ করতো তবে কি আমি সেটা পছন্দ করতাম ? আর আমার স্ত্রীওতো কারো না কারো মেয়েই, ঠিক আছে যা হবার হয়ে গেছে এই কথা মনে করে সে স্ত্রীকে কিছুই বললো না । নামায পড়ে আল্লাহ্কে বললো এ আল্লাহ্ এটা তোমার এক বান্দি এর একটা ভূল হয়ে গেছে, আমি তাকে কিছুই বলিনি বরং মাফ করে দিয়েছি । পরে এক বুজুর্গ স্বপ্ন দেখে তাকে জানালেন যে তুমি যে সেদিন তোমার স্ত্রীকে মাফ করে দিয়েছিলে এর উপর খুশী হয়ে আল্লাহ্ পাকও তোমার জীবনের সমস্ত ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন, আর তোমার জন্য জান্নাতের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে । এমন আরো বহু ঘটনা আছে যে মানুষ হয়ে মানুষকে মাফ করে দেওয়ার কারনে আল্লাহ্ পাক মানুষকে বহু বড় বড় দরজা নসীব করেছেন ।

আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও পারস্পারিক সহানুভূতি নিজ ঘরকে জান্নাত বানানোর এক বিরাট বড় নমুনা, বৈরিতা আমাদের তরফ থেকে যেন না হয়, তবে আর সেই পরিবেশের সৃষ্টি হবে না যা কখনো কখনো হয়ে যায় । বৃটেনে তালাকের বহু ঘটনা আছে, নিজ স্ত্রী থাকা স্বত্বেও কখনো কখনো অন্যর উপর দৃষ্টি পড়ে যায়, এ অবস্থায় যদি নতুন জায়গায় প্রস্তাব গ্রহন হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে অনেক সময় বর্তমান স্ত্রীর উপর থেকে দৃষ্টি সরে যায়, মন উঠে যায় । থানবী (রঃ) এক ঘটনা লিখেছেন এক লোকের ৫ সন্তান ছিল, এ অবস্থায়ও সে তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেবার সিদ্ধান্ত নিলে, স্ত্রী অনেক কাকুতি মিনতী করে বললো দেখ আমার ৫ সন্তান হয়ে গেছে এখন আমাকে তাড়ীয়ে দিলে এদের নিয়ে আমি কোথায় যাব, যদি ছেড়েই দিবে তো যখন বিয়ে করে এনেছিলে পছন্দ না হয়ে থাকলে তো তখনই ছেড়ে দিতে পারতে, দয়া করে আমাকে তালাক দিওনা আমি তোমার ঘরের চাকরানী হয়ে থাকবো তবুও একেবারে বের করে দিওনা । কিন্তু ভদ্রলোক তালাক দিলেন ও অল্প বয়সী এক মেয়েকে বিয়ে করলেন । প্রথম স্ত্রীর মন থেকে বদদোয়া বের হলো । ছয় মাস পর ঐ লোক বিকলাঙ্গ হয়ে গেলে নতুন স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেল । এর পর দশ বছর ঐ লোককে চেয়ারে বসে পেশাব পায়খানা করতে হয় । আজ প্রথম স্ত্রী যদি থাকতো তবে ছেড়ে পালাতো না, এই দূর্দিনে তার সেবাযত্ন করতো । এমনি জানা অজানা বহু ঘটনা ঘটেছে আর আজো হাজারো ঘটনা ঘটে চলেছে আমাদের চার পাশে প্রতি নিয়ত । ছোট বড় এমনি নানান ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছি আমরা সবাই অথচ আমাদের কারোই যেন সময় নেই এগুলো নিস্পত্তির, আর এ নিয়ে সামান্য একটু চিন্তা ভাবনা করার ।

আল্লাহ্ পাক এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে খুবই অল্প সময়ের জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এই দুনিয়ায় । এ সময়ের এক বিরাট অংশ কাটে আমাদের সংসার জীবনে । ক'জন মানুষই বা থাকে একটা সংসারে অথচ মানুষ এতই কমজোর যে এই ক'জনের মধ্যেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না কোন রকমেও । এ সংসার জীবনের সাফল্যের উপরই মূলত নির্ভর করে আমাদের প্রাপ্ত এ সামান্য সময়টুকুর যথাযথ ব্যবহার । অথচ আমরা সবাই এ ব্যাপারে যথেচ্ছ উদাসীন । চকীত যদিও কখনো ফিরে আসে তবে তা সময় হারানোর পর । আমাদের জন্য কি সত্যিই এটা এত কঠিন যে আমাদেরই স্বার্থে আমরা এ অল্প সময়ের জন্য আরেকটু ধৈর্য ধারন করবো, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহানুভূতি থাকবে, থাকবে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সহমর্মিতা , ধৈর্য, সহ্য, সমঝোতা আর মায়া মমতা । এর ফল তো অন্য কেউ এসে ভোগ করবেনা, এতে করে আমাদেরই দু' জনের জন্য আমাদের ঘর হয়ে উঠবে পার্থিব জান্নাত । সুখ সাচ্ছন্দে কাটবে আমাদের পার্থিব জীবন, আর বদলা পাওয়া যাবে আল্লাহ্র কাছ থেকেও । এর আসর পড়বে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের উপর । আসুন আমরা আল্লাহ্র সাহায্য চাই আমাদের প্রতি পদক্ষেপে, আমাদের প্রতিটি ঘর যেন হয় এক একটি বেহেশত ।